মূলপাতা

বিচ্ছিন্নতা থেকে সমষ্টি

Asif Adnan

June 28, 2022

6 MIN READ

পর্ব ১৩

লেখাটি **"What Is To Be Done: ইসলামবিদ্বেষ, উগ্র-সেক্যুলারিসম এবং বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ভবিষ্যৎ"**সিরিযের অংশ। আগের পর্বের লিঙ্ক এখানে, সবগুলো পর্বের লিঙ্ক একসাথে এখানে

আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি সম্পর্কতৈরি হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র আর ব্যক্তির মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী থাকে না। প্রথম দেখায় বিষয়টা ভালো মনে হলেও, বাস্তবে এই ধরণের সম্পর্কতীব্র ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। চিন্তা করে দেখুন, রাষ্ট্র যদি যালিম হয়, অধিকার হরণকারী হয়, রাষ্ট্রযন্ত্র যদি কোন গোষ্ঠীর হাতিয়ারে পরিণত হয়—তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

একদিকে অতিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র, আরেকদিকে ক্ষুদ্র, দুর্বল, বিচ্ছিন একেক জন মানুষ। রাষ্ট্র ইচ্ছেমতো নাগরিকদের অধীনস্ত ও ধ্বংস করতে পারবে। এবং আধুনিক রাষ্ট্র ঠিক তাই করে।

কিন্তু ব্যাপারটা সবসময় এমন ছিল না। গোত্রীয় সমাজের কথা চিন্তা করুন। এমন সমাজে ব্যক্তির সাথে শাসকের সম্পর্কের মাঝখানে থাকে তার গোত্র। যখন সে মযলুম, গোত্র তাকে সহায়তা করে। তার পক্ষ হয়ে আলোচনা কিংবা দরকষাকষি করে। প্রয়োজনে আক্রমনের মুখে তাকে রক্ষা করে।

একাকী মানুষ দুর্বল, কিন্তু গোত্রের অংশ হিসেবে; একটা সামষ্টিক সত্ত্বার অংশ হিসেবে তার দুর্বলতা কমে। এই সামষ্টিক পরিচয় শুধু যে গোত্রের মাধ্যমেই তৈরি হতে হবে, তা কিন্তু না। ভাষা, সংস্কৃতি, আদর্শ, দ্বীন, স্বার্থ, শ্রেণী পরিচয়সহ বিভিন্ন কিছুর ভিত্তিতে এই সামস্টিক পরিচয় ও সংহতি গড়ে উঠতে পারে এবং উঠেছে।

কিন্তু আধুনিকতা চেষ্টা করে সব ধরনের সামষ্টিকতাকে মুছে দিতে। সব সামষ্টিক পরিচয় ও আদর্শকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র সেখানে স্রেফ দুটো ধারণা বসাতে চায়– জাতীয়তাবাদ এবং নাগরিকত্ব। আর দুটি ধারণার ভিত্তিই হল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। কাজেই আধুনিকতার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে বাকি সব সম্পর্কথেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে যুক্ত করা। কাগজে কলমে ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এই সম্পর্কপারস্পরিক চুক্তির। কিন্তু বাস্তবে এই সম্পর্কঅধীনস্ততা, নিয়ন্ত্রন আর জবরদস্তির।

মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা আরো বেশি তীব্র। ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্বল করা হয়। তারপর সেগুলোকে সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় অথবা অধীনস্ত করা হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের। (বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন এবং উপমহাদেশের কওমী মাদ্রাসা আন্দোলন–দুটোকেই এক অর্থে রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রনের বাইরে নিজস্ব কিছু জায়গা খোদাই করে নেয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।)

ইসলামের সামাজিক শক্তি ধ্বংস করা এবং ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিমদের সংগঠিত হবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে মুছে ফেলার এই প্রকল্প শুরু হয়ে ঔপনিবেশিক আমলে। ফিরিঙ্গিদের শুরু করা এই পরে কাজকে চালিয়ে নিয়ে যায় নব্য-উপনিবেশিক “স্বাধীন” রাষ্ট্রগুলো। তারা আজো তাই করে যাচ্ছে। ফলে তৈরি হয়েছে অ্যাটমাইযড (atomized) মানুষ—যারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

এই বিচ্ছিন্নতার অর্থ দুর্বলতা। আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র কিছু মানুষ, রাষ্ট্র নামক অতিকায় দানবের মুখোমুখি। এমন মানুষের সামষ্টিক কোন শক্তি থাকে না, নিজস্ব কন্ঠ থাকে না। তার চেয়ে বড় কথা, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে না। নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কিংবা স্বার্থ রক্ষার জন্যও সহজে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না তারা। এমন কোন উদ্যোগ নেয়ার সময় তার মধ্যে কাজ করে নানা সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ভয়। বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রতিরোধে অক্ষম। পরিবর্তনে অক্ষম।

এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার প্রথম ধাপ হল সংগঠিত হওয়া। বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজে নিজে কার্যকরভাবে যুলুম এবং বৈষ্যমের মোকাবেলা করতে পারে না। এর জন্য কাজ করতে হয় সমষ্টিগতভাবে। আধুনিক যুগে সত্যিকারের দাবি আদায়ের কিংবা বড় ধরণের পরিবর্তনের যতো উদাহরণ আছে তার সবই অর্জিত হয়েছে কোন না কোন ধরণের সামষ্টিক কর্মসূচীর মাধ্যমে।

শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, গেরিলা যুদ্ধের কথা বলুন, কিংবা বিপরীত প্রান্তের লবি, প্রেশার গ্রুপ, সংখ্যালঘুদের অধিকার আন্দোলন বলুন—সবই কোন না কোন ধরণের সামষ্টিক, সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল।

বাংলাদেশের মুসলিমের বর্তমানের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হলে তাই বাস্তব দুনিয়াতে (অনলাইনে না) একত্রিত হতে হবে। বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে পরিণত করতে হবে সমষ্টিতে।

- কোন মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক দল আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। সাময়িকভাবে আমাদের কাছে টানলেও দিন শেষে তারা সাংস্কৃতিক জমিদার মন রেখে চলারই চেষ্টা করবে।
- বাহ্যিক শক্তি আমাদের সাহায্য করবে না। বরং আশেপাশের শক্তিরা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে।
- সংবিধান, জাতীয়তা, ইতিহাস কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়েও লাভ হবে না। কারণ এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা ঠিক করে সেক্যুলার-কালচাড়াল জমিদাররাই। তারাই এগুলোর "সঠিক ব্যাখ্যা" ঠিক করে।

কাজেই পরিবর্তন চাইলে আমাদের নিজেদের সংগঠিত হয়ে কাজ করতে হবে। এই সিরিযের শুরু থেকে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি—সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, আর্থসামাজিক সমস্যার আলোচনায় ইসলামকে উপস্থাপন করা, সর্বোপরি ইসলাম সামাজিক শক্তি হিসেবে হাজির করা—এই সব কিছু অর্জনের জন্য বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করা আবশ্যক।

আজকের এই ইসলামবিদ্বেষ, বৈষম্য, অপমান আর অবমাননা বন্ধ করতে চাইলে—নিজের জন্মভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হয়ে থাকার বাস্তবতাকে বদলাতে হলে–নিজেদেরকেই উদ্যোগ নিতে হবে। গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী স্ট্র্যাটিজি। আর তা বাস্তবায়ন করতে হবে সবর, ফিরাসাহ আর হিকমাহর সাথে।

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। বাস্তব দুনিয়াতে সংগঠিত হওয়া বলতে এখানে রাজনৈতিক সংগঠন বা এ জাতীয় কিছু তৈরি, কিংবা "গণতান্ত্রিক ইসলামী" দলের সাথে যুক্ত হবার কথা বলা হচ্ছে না। মিছিল, মানববন্ধন বা এধরণের উদ্যোগের কথাও বোঝানো হচ্ছে না।

মিছিল, মানববন্ধনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা মূল কাজের একটা ছোট অংশ কেবল। এই ধরণের কর্মসূচীগুলো সাধারণত ইস্যুভিত্তিক হয়। অর্থাৎ এই কর্মসূচীগুলো সাময়িক, এবং এগুলো মূল উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য ব্যবহৃত কিছু মাধ্যম। মাধ্যমকে যেন আমরা উদ্দেশ্য মনে না করি।

কোন নির্দিষ্ট ইস্যুতে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিছিল করা যেতে পারে। কিন্তু মিছিল করাই যেন মূল উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। এই পার্থক্য বোঝা জরুরী। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা না থাকলে কেবল মিছিল, অবরোধ কিংবা লংমার্চ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আসবে না। তাতে লোক সমাগম যতো বেশিই হোক না কেন।

সমাজের ওপর সেক্যুলার জমিদারদের আধিপত্য ভাঙ্গা এবং ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করতে গেলে প্রথমে মুসলিমদের মধ্যে আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি জোরালো করতে হবে। তারপর সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে। যাতে মুসলিমরা; বিশেষ করে তরুণরা এমন কিছু প্ল্যাটফর্ম পায় যেখানে তারা একত্রিত হতে পারবে। যেখানে বিচ্ছিন্নতা থেকে বের হয়ে তারা সমষ্টির মাঝে শক্তি খুঁজে পাবে। এমন কিছু মঞ্চ তাদের জন্য তৈরি করতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের সামনে তারা নিজের কথা এবং চিন্তাগুলো তুলে ধরতে পারবে।

সেটার শুরু হতে পারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী ইতিহাস" কিংবা "ইসলামী সভ্যতা ও চিন্তা" কেন্দ্রিক ক্লাব গড়ে তোলার মাধ্যমে।

হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে "ইসলামবিদ্বেষের ব্যাপারে সচেতনতা" সৃষ্টির জন্য সংস্থা তৈরি করে।

কিংবা হতে পারে আর্থসামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ইসলামের অবস্থান বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপনের জন্য গবেষণা সংস্থা তৈরি করে।

কাজ করা যেতে পারে সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে – পর্নোগ্রাফি, যিনা, মাদক, ডিপ্রেশন, সুইসাইড, পরিবারের ভাঙ্গন, স্ক্রিন আসক্তি, ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস – কাজ করার মতো ইস্যু অনেক। কাজ হতে পারে দাওয়াতী এবং ইসলাহী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও।

ধরণ যাই হোক মূল আলোচনা ইসলাম এবং মুসলিম পরিচয়ের বিষয়টা থাকতে হবে স্পষ্টভাবে । ইসলামকে মূল ভিত্তি এবং দিকনির্দেশনা হিসেবে নেয়ার ব্যাপারটা থাকবে দাওয়াহর কেন্দ্রে। এখানে লুকোচুরি করা যাবে না।

একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে আলোচনা বা বক্তব্য যেন নিরেট তাত্ত্বিক না হয়। মানুষ প্রভাবিত হবে যখন সে নিজের জীবনে ও সমাজে আপনার কথার প্রযোজ্যতা খুঁজে পাবে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে আমলের তাগিদ এ ক্ষেত্রে অতোটা কার্যকরী হবে না। বরং মানুষকে দেখাতে হবে কিভাবে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং শাসনের সমস্যারগুলোর সমাধান দেয়।

এই পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। এবং এর শুরুটা কঠিন, রাতারাতি বিশাল কিছু করে ফেলার, শর্টকাট নেয়ার, কিংবা অল্প সময়ে বড় রিটার্নের সুযোগ এখানে তেমন একটা নেই। কাজ শুরু করতে হবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। তবে সব মহীরুহের শুরুটা ছোট্ট বীজ থেকেই হয়।

পরের পর্বের লিঙ্ক